মুসলিম ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব
Muslim Unity and Brotherhood

(মকতুবাত গ্রন্থের বাইশতম পত্রের বঙ্গানুবাদ)
Translation of Twenty Second Letter of “ Letters”

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী (রহঃ)
Bediuzzaman Said Nursi (R)

অনুবাদ
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) মির্জা তবারক হোসেন বেগ
Translated by
Brigadier General (retd) Mirza Tabarak Hossain Beg

Resale-i Nur Trust, Dhaka , Bangladesh

بسم الله الرحمن الرحيم

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী (রহঃ) ও রিসালে-ই নূর
(Who is Bediuzzaman Said Nursi and What is Resale-i Nur)

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী (রহঃ) ১৮৭৭ সালে পূর্ব তুরস্কের বিতলিস প্রদেশের নূরস্ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন এবং অনেক সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের পথ মাড়িয়ে ৮৩ বছর বয়সে ১৯৬০ সালে উরফায় ইন্তেকাল করেন ।

তিনি অতি উচ্চ স্তরের আলেম ছিলেন যিনি প্রথাগত ধর্মীয় বিষয় ছাড়াও আধুনিক বিজ্ঞানে শিক্ষিত ছিলেন । যৌবনেই তিনি শিক্ষা দীক্ষায় অসাধারণ বুৎপত্তি লাভ করেন এবং *বদিউজ্জামান* (কালের বিস্ময়) খেতাব অর্জন করেন । বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী (রহঃ) এর জীবনকাল খিলাফাত ও উসমানী সাম্রাজ্য, প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর এর পতন ও বিভাজন এবং ১৯২৩ সালে তুর্কী প্রজাতন্ত্রের গঠন ও তারপরের ৩৭ বছর পর্যন্ত ব্যপ্ত ।

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পরবর্তী কয়েক বছর পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯২৩ সাল পর্যন্ত ইসলামের পথে বদিউজ্জমান সাঈদ নূরসী (রহঃ) এর সংগ্রাম জনসাধারন্যে নিয়োজিত ছিলো । তিনি অগনিত ছাত্রকে শিক্ষাদান এবং সমকালিন প্রথম সারির আলেমদের সংগে বিভিন্ন দ্বিনী কর্মকান্ডে জড়িত থাকা ছাড়াও পূর্বতুরস্কে রুশ সৈন্যদের আক্রমণ প্রতিরোধে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতৃত্ব দান করেন । এই বাহিনীর সাথে রুশদের বিরুদ্ধে দুই বছর যুদ্ধে সক্রিয় থাকার পর যুদ্ধাহত অবস্থায় তিনি বন্দী হন । বন্দীত্ব থেকে অলৌকিকভাবে মুক্তিলাভের পর ইসলামের স্বার্থ সমুন্নত করার জন্য জনজীবনে বিভিন্ন কর্মকান্ডে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন । যাহোক, যে

বছরগুলোতে ওসমানী সম্রাজ্য ভেঙ্গে তা প্রজাতন্ত্রে রূপ লাভ করে সেই বছর গুলোতেই তিনি “পুরাতন সাঈদ” থেকে “নতুন সাঈদ” এ রূপান্তরিত হন । “নতুন সাঈদ” এ রূপান্তর ছিল তাঁর জন্য জনজীবন থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে পড়াশুনা ও ইবাদত-বন্দেগীতে নিজেকে মগ্ন রাখা, যা তখন ছিল এক নতুন ধরনের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি ।

দুই বছর পরে অর্থাৎ ১৯২৫ সালে তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকারের অনৈসলামিক কর্মকান্ড ও দমন নীতির বিরোধিতা করায় তাঁকে পশ্চিম আনাতোলিয়ায় নির্বাসিত করা হয় এবং এর পরের পঁচিশটি বছর তাঁর জীবন শাসক গোষ্ঠীর অত্যাচার, হয়রানি এবং কারাদন্ড ভোগের মাধ্যমে অতিবাহিত হয় । কিন্তু কারাদন্ড ও নির্বাসনের এই বছরগুলিতেই প্রায় ছয় হাজার পৃষ্ঠার “রিসালে-ই নূর”---“আলোর প্রবন্ধসমূহ” লিখিত হয় এবং সমগ্র তুরস্কে তা ছড়িয়ে পড়ে । সাঈদ নূরসী নিজেই বলেন, “এখন আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি যে, আমার জীবনের অধিকাংশ সময়ই নিজ ক্ষমতা, দূরদর্শিতা, উপলব্ধি এবং ইচ্ছার বাইরে এমনভাবে পরিচালিত হয়েছে যাতে কোরআনের খেদমতের জন্যই এই প্রবন্ধ গুলো লিখিত হয় । জ্ঞান চর্চায় ব্যয়িত আমার সমগ্র জীবন যেন ছিল রিসালে-ই নূর লেখার প্রাথমিক প্রস্তুতি মাত্র ।”

ইসলামী দুনিয়ার অধঃপতনের মূল কারণ যে ঈমানের ভিত্তি দূর্বল হয়ে যাওয়া, একথা বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী (রহঃ) বুঝতে পেরেছিলেন । এই দূর্বলতার সাথে বস্তুবাদ ও নাস্তিক্যবাদ এবং অন্য সকল শক্তির আক্রমণ এক হয়ে উনবিংশ এবং বিংশ শতকে ঈমানের ভিত্তিকে দূর্বল করে দেয় । ফলে তাঁর এই বদ্ধমূল ধারণা হয় যে ঈমানকে মজবুত করা, এমনকি বাঁচিয়ে রাখাই বর্তমান সময়ের সবচেয়ে জরুরী এবং প্রধান কাজ । সে সময় যা প্রয়োজন ছিল তা হচ্ছে ইসলামের ইমারতকে তার ভিত্তি থেকে পূনঃনির্মাণ করার নিমিত্তে সকল প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা এবং কলমের জিহাদের মাধ্যমে সকল আক্রমণকে প্রতিহত করা ।

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী (রহঃ)এর নির্বাসিত ও বন্দী জীবনে রচিত রিসালে-ই নূর আধুনিক মানুষের কাছে ঈমানের মৌলিক বিষয় ও কোরআনের হাকীকত ব্যাখ্যা করে । তাঁর নিয়ম ছিল ঈমান ও কুফর দুটিকেই যুক্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা । তিনি এটাও দেখান যে কোরআনের নিয়ম অনুসরণ করেই ঈমানের হাকীকত, আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ববাদ, রিসালাত এবং সশরীরে পুনরুত্থান এ সবই প্রমান করা সম্ভব কারণ এই সত্য সমূহ বিশ্বজগৎ এবং মানব কূলের সৃষ্টি ও অস্তিত্বেরও যথাযত ব্যাখ্যা ।

বিভিন্ন কাহিনী, উপমা, ব্যাখ্যা এবং জোরালো যুক্তির মাধ্যমে বদিউজ্জামান এ কথা প্রমাণ করেন যে দ্বীনের হাকীকত আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বরং বিজ্ঞানের জড়বাদী ব্যাখ্যাই অসম্ভব ও অযৌক্তিক । বস্তুতঃ রিসালে-ই নূরে তিনি এ কথাই প্রমাণ করেন যে বিশ্ব জগতের কর্মকান্ড বিষয়ক বিজ্ঞানের শ্বাসরুদ্ধকর আবিস্কার দ্বীনের হাকীকতকেই বরং মজবুত করে ।

রিসালে-ই নূরের গুরুত্ব অতি রঞ্জিত করার কোন অবকাশ নেই কারণ বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী (রহঃ) নিজেই তুরস্কের ইতিহাসের অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে ইসলামী আকিদা ও ঈমানকে পূনর্জীবিত করেন ; এবং নিশ্চিতভাবে তার এই ভূমিকার গুরুত্ব বর্তমান সময় পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে । এছাড়াও রিসালে-ই নূর শুধুমাত্র যে মুসলমানদের সমস্যার সমাধান দেয় তাই নয় বরং সমস্ত মানবকূলের জন্যেও তা বেশ কয়েকটি কারণে প্রযোজ্য । প্রথমতঃ রিসালে-ই নূর লেখা হয়েছে আধুনিক মানুষের মানসিকতাকে লক্ষ্য রেখে, যে মানসিকতা মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে জড়বাদী দর্শনে আচ্ছন্ন এবং এই জড়বাদী দর্শন যে সব বিভ্রান্তি, সন্দেহ ও প্রশ্নের জন্ম দেয়, রিসালে-ই নূর তার সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম । এটা আধুনিক মানুষের সকল “কেন” এর উত্তরও দিয়ে দেয় ।

রিসালে-ই নূর ঈমানের অতি গভীর বিষয়বস্তু সাধারন মানুষের জন্য এমন সহজ সরল ভাবে ব্যাখ্যা করে যে নবীনরাও তা বুঝতে পারে এবং ফায়দা লাভ করতে পারে । অথচ

ইতোপূর্বে ঈমানের এ সমস্ত সুক্ষ্ম ও সুগভীর বিষয় শুধুমাত্র বিজ্ঞ আলেমগণই পড়াশুনা করতেন ।

বিশ্ব জগৎ এবং মানুষের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি রিসালে-ই নূরে এ কথা প্রমাণ করেছেন যে, প্রকৃত সুখ ঈমান এবং আল্লাহর পরিচয় লাভের মাঝেই নিহিত রয়েছে । তিনি এও দেখিয়ে দেন যে অশান্তি ও যন্ত্রণা যা কুফরের মাধ্যমে জন্ম নিয়ে মানুষের আত্মা এবং বিবেককে আচ্ছন্ন করে তা শুধুমাত্র ঈমানের আশ্রয়েই নিবৃত করা সম্ভব ।

পবিত্র কোরআন মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে সম্বোধন করে । এই প্রজ্ঞাময় কিতাব মহাবিশ্ব ও তার সতত সঞ্চরণশীলতার প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যাতে সে সৃষ্টজীব হিসেবে তার নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনুধাবন করতে পারে । রিসালে-ই নূরে সাঈদ নূরসী শিক্ষাদানের এই পদ্ধতিই অনুসরণ করেছেন । তিনি মহাবিশ্বের প্রকৃত রূপকে মহান স্রষ্টার নিদর্শন (আয়াত) হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন । তিনি অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, উপরোক্ত ব্যাখ্যার আলোকে এই আয়াত সমূহ যদি পাঠ করা হয় তাহলে ঈমানের মৌলিক বিষয় সমূহের হাকীকত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এ পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি এমন প্রকৃত ও মজবুত ঈমানের স্তরে পৌছাতে সক্ষম হয় যা প্রকৃতিবাদ, জড়বাদ ও নাস্তিক্যবাদের সুক্ষ্ম বেড়াজাল থেকে উদ্ভূত সংশয় সমূহের মোকাবেলা করতে সক্ষম । সকল বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নতির অর্থ হচ্ছে নিখিল বিশ্বের দ্বার উন্মোচন করা । এই নিখিল বিশ্বকে যদি দেখা হয় এক বিশাল গ্রন্থরূপে যার প্রতিটি অক্ষর **"গ্রন্থ প্রণেতা"**র প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে তাহলে তা ঈমানের বুনিয়াদকে শুধু মজবুতই করে না, তাকে গভীর ও সম্প্রসারিতও করে ।

মানুষের মৌলিক চাহিদা হচ্ছে এমন এক দ্বীন যার মাধ্যমে সে মহান স্রষ্টা আল্লাহকে তাঁর সকল সুন্দরতম নাম (ইসম) ও গুণাবলী (সীফাত)সহ চিনতে সক্ষম হয় । রিসালে-ই নূর মানুষের কাছে তার স্রষ্টার পরিচিতি সহজ ও সাবলীলভাবে উপস্থাপন করে; এটা মুসলিমদেরকে তাক্‌লিদি ঈমান থেকে তাহ্‌কিকি ঈমানের দিকে পথ দেখায় ; অমুসলিমদেরকে সৃষ্টির উপাসনা থেকে স্রষ্টার উপাসনার দিকে আহ্বান করে । বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী (রহঃ) এর রিসালে-ই নূর মহাপ্রজ্ঞাময় কোরআনের পথ দেখায় ।

বাইশতম পত্র

তাঁর নামে ।
এবং এমন কিছুই নেই যা তাঁকে প্রশংসার মাধ্যমে মহিমান্বিত না করে ।

(এই পত্রে দুটি বিষয় আছে, প্রথমটি মুমিনদেরকে ভ্রাতৃত্ব এবং ভালোবাসার দিকে আহ্বান জানায়)

প্রথম বিষয়

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

> *"মুমিনরাতো পরস্পর ভাই ভাই, অতএব তোমরা তোমাদের দু ভায়ের মধ্যে মীমাংসা করবে ।"[১] "সমান নয় ভালো ও মন্দ । জবাবে তাই বলুন যা উৎকৃষ্ট । তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু ।"[২] "যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদিগকেই ভালোবাসেন ।"[৩]*

মুমিনদের ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনে পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ, দলাদলি, জেদাজেদি ও হিংসা তাদের মধ্যে বিদ্বেষ এবং বৈরীতার জন্ম দেয় । মহোত্তম মানবধর্ম ইসলামের হিকমত এই সাক্ষ্য দেয় যে বিদ্বেষ ও বৈরীতা অতিশয় রুচিহীন, জঘন্য ও ক্ষতিকর ; এগুলো মানুষের জীবনে বিষবৎ । উপরোক্ত সত্যের অগণিত আঙ্গিক সমূহের মধ্য থেকে মাত্র ছয়টি আঙ্গিকের উপর এখানে আলোকপাত করা হলো ।

■ প্রথম আঙ্গিক

সত্যের আলোকে বিবেচনা করলে এগুলো পাপপূর্ণ । মুমিনদের প্রতি বিদ্বেষ ও বৈরীতা পোষণকারী হে বেইনসাফ ব্যক্তি ! ধরা যাক তুমি একটি জাহাজ অথবা বাড়ীতে নয়জন নির্দোষ এবং একজন দোষী ব্যক্তির সাথে অবস্হান করছো । এখন যদি কেউ ঐ দোষী ব্যক্তির কারণে জাহাজটিকে ডুবিয়ে দিতে অথবা বাড়ীটিতে আগুন ধরিয়ে দিতে উদ্যত হয় তাহলে নিশ্চয় বুঝতে পারছো সে কত বড় পাপী হবে । নিশ্চয় তুমি তার পাপিষ্ঠতার বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করবে । যদি ঐ জাহাজে একজন নির্দোষ এবং নয়জন দোষী ব্যক্তিও থাকতো তবুও জাহাজটিকে ডুবিয়ে দেওয়া ইনসাফের পরিপন্থী হতো ।

তেমনি একজন মুমিন ব্যক্তি যাকে বেহেশতী নিবাস অথবা জাহাজের সাথে তুলনা করা যায়, তার শুধু নয়টি নয় বরং ঈমান, ইসলাম এবং সৎপ্রতিবেশীসুলভ মনোভাব ইত্যাদি আরও বিশটিরও অধিক গুণাবলী আছে । এখন যদি তার মাঝে বিদ্যমান একটিমাত্র দোষ যা তোমার ক্ষতির কারণ হয় অথবা তোমাকে অসন্তুষ্ট করে, এবং শুধুমাত্র একারণেই যদি তুমি তার ব্যক্তি সত্বাকে ধ্বংস করতে অথবা তার ঘরকে পুড়িয়ে দিতে উদ্যত হও তাহলে তুমি নিজেও এক দারুণ নিষ্ঠুরতার দোষে দোষী সাব্যস্ত হবে ।

■ দ্বিতীয় আঙ্গিক

---
১. আল কোরআন ৪৯ ঃ ১০
২. আল কোরআন ৪১ ঃ ৩৪
৩. আল কোরআন ৩ ঃ ১৩৪

জ্ঞানের বিচারে এগুলো পাপময়, কেননা অনুরাগ ও বিরাগ হচ্ছে বিপরীতধর্মী, ঠিক যেমন আলো ও আঁধার । নিজ নিজ মূল বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে এ দুয়ের মিলন সম্ভব নয় ।

অনুরাগ সৃজনকারী গুণাবলীর প্রাধান্যের কারণে কোন হৃদয়ে যদি যথার্থই অনুরাগের জন্ম হয়, সে হৃদয়ের বিরাগ শুধুই রূপকমাত্র, যা করুণায় রূপান্তরিত হয় । একজন মুমিনের উচিৎ তার ভাইকে ভালোবাসা এবং সে তাকে ভালোবাসে বিধায় তার মধ্যে মন্দ কিছু দেখলে সে ব্যথিত হয় ; তার প্রতি রূঢ় আচরণ নয় বরং সংশোধন প্রচেষ্টায় বাড়িয়ে দেয় করুণার হাত। একারণেই আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন *"কোন মুমিনের উচিৎ নয় অন্য মুমিনের সাথে রাগ করে তিন দিনের বেশী কথা না বলা ।"*[৪]

বিরাগের জন্ম দেয় এমন কারণ সমূহের প্রাধান্যের কারণে যদি প্রকৃত বৈরীতা কোন হৃদয়ে আসন গেড়ে বসে তবে সে হৃদয়ের অনুরাগ শুধু রূপকমাত্র, যা চাতুরী এবং স্তাবকতার রূপ ধারণ করে।

হে বেইনসাফ মানুষ ! তাহলে দেখো এক মুমিন ভায়ের বিরুদ্ধে বৈরীতা ও বিদ্বেষ কি মহাপাপ ! তুমি যদি সামান্য নুড়ি পাথরকে বলো কাবা ঘরের চেয়ে দামী আর ওহুদ পর্বতের চেয়ে বড়, তা হবে এক কুৎসিত অযৌক্তিকতা । তাহলে ঈমান, কাবার মত যা দামী এবং ইসলাম, ওহুদের মত যা চমৎকার---এই ঈমান, ইসলাম ও অন্যান্য ইসলামী গুণাবলী চায় অনুরাগ আর ঐক্যমত্য। বৈরীতা সৃষ্টিকারী ছোট ছোট নুড়ি পাথর সাদৃশ ত্রুটি-বিচ্যুতিকে যদি তুমি ঈমান এবং ইসলামের উপর প্রধান্য দাও তবে তা হবে মহাপাপ, বিরাট অবিচার এবং চরম বোকামী ।

তৌহিদী ঈমানের জন্য প্রয়োজন তৌহিদী হৃদয় এবং আমাদের ধর্মমতের একত্ব চায় আমাদের সমাজের একত্ব । যদি তুমি আর একজনের সাথে নিজেকে একই সৈন্যদলে দেখতে পাও, তবে তুমি তার সাথে এক বন্ধুত্বের বন্ধন গড়ে তুলবে ; একই সেনা অধিনায়কের নির্দেশ পালনের ফলে তোমাদের দুজনের মাঝে এক ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠবে । অনুরূপভাবে একই শহরে বসবাস করার কারণে আর একজনের প্রতি তুমি ভ্রাতৃত্ববোধ অনুভব করবে । তোমাদের মাঝে বিরাজমান ঐক্যের বন্ধন, একতার গ্রন্থি ও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক আল্লাহর নাম সমূহের মতই অগণিত এবং বিশ্বাসের চেতনা ও আলোয় তা প্রতিভাত হয় ।

তোমাদের স্রষ্টা, মালিক, উপাস্য এবং রিয্কদাতা এক ও অভিন্ন ; হাজারো জিনিস তোমাদের জন্য এক ও অভিন্ন । তোমাদের নবী, তোমাদের দ্বীন, তোমাদের কিব্লা এক ও অভিন্ন ; এরূপ শত শত জিনিস তোমাদের জন্য এক ও অভিন্ন । তেমনি তোমাদের গ্রাম এক, প্রদেশ এক, দেশ এক ; এরূপ আরো অনেক জিনিস তেমনিভাবে ঐক্য ও একত্ব, সমন্বয় ও মিলন, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদির প্রতি দিক নির্দেশ করে । মহাবিশ্বের গ্রহ-নক্ষত্রও এমনিভাবে এক অদৃশ্য বাঁধনে পরস্পরের সাথে বাঁধা । এতদসত্বেও তুমি যদি মূল্যহীন ও মাকড়াসার জালের মত ক্ষণস্থায়ী বস্তু পছন্দ করো যা একজন মুমিনের প্রতি ঝগড়া-বিবাদ ও বিদ্বেষ-বিরাগ এর জন্ম দেয় এবং তুমি তার প্রতি সত্যিকার বৈরীতা পোষণ করো তাহলে তুমি নিশ্চয় বুঝবে---যদি তোমার হৃদয় মৃত এবং বুদ্ধি নিঃশেষ না হয়ে থাকে---সেই ঐক্যের বন্ধনের প্রতি অশ্রদ্ধা, সেই ভালোবাসার সম্পর্কের প্রতি অবজ্ঞা, সেই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের বিরুদ্ধে তোমার সীমালংঘন কত গুরুতর ।

■ তৃতীয় আঙ্গিক

"কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না"[৫]

---

৪. *বুখারী,* আদাব, ৫৭, ৬২ ; *মুসলিম,* বির্ ২৩
৫. আল কোরআন ৬ ঃ ১৬৪
৬. আল কোরআন ১৪ ঃ ৩৪

এই আয়াত নিখাদ সুবিচারের কথা ব্যক্ত করে । অতএব একজন মুমিনের প্রতি বিদ্বেষ ও বিরাগ পোষণ করা যেন তার সমস্ত গুনাবলীকে একটিমাত্র দোষের কারণে অস্বীকার করা । উপরোক্ত আয়াতের অর্থের বিচারে তা হবে এক বিরাট বেইনসাফী। আবার একজন মুমিনের একটিমাত্র দোষের কারণে যদি তুমি তোমার বৈরীতাকে প্রসারিত করে তার সমগ্র আত্মীয় স্বজনের প্রতি বিরাগ পোষণ করো তাহলে, *" নিশ্চয় মানুষ অন্যায়কারী ....."*[৬] এই আয়াতের মর্মানুযায়ী তুমি আরো বড় পাপ ও সীমালংঘন করবে, যার বিরুদ্ধে শরীয়াহ এবং ইসলামের হিকমত উভয়ই তোমাকে সতর্ক করে । তাহলে তুমি নিজেকে কিভাবে সঠিক মনে করবে এবং বলবে " আমিই সঠিক পথে আছি "?

সত্যের বিচারে বৈরীতার কারণ সমূহ ও সকল মন্দ বিষয় নিজেরাই অশুভ এবং মৃত্তিকার মত অস্বচ্ছ । এগুলো নিজে নিজেই অন্যের মাঝে সংক্রামিত হয় না ; তবে যদি কেউ এগুলোর প্ররোচনায় মন্দ কাজ করে তবে তা অন্য কথা । ভালো গুণাবলী যা অনুরাগের জন্ম দেয় তা অনুরাগের মত দিপ্তীময় ; এগুলো অন্যের মাঝে প্রবেশ করে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে । একারণেই কথায় বলে যে, "বন্ধুর বন্ধুও বন্ধু হয়" এবং এও বলা হয় যে, "একটি সুন্দর চোখের কারণে অনেক চোখকেই সুন্দর মনে হয় ।"

অতএব হে বেইনসাফ মানুষ ! এই যদি হয় সত্য তাহলে তুমি নিশ্চয়ই অনুধাবন করতে পারবে---সত্য অনুধাবন করার ক্ষমতা যদি তোমার থেকে থাকে---তোমার অ-পছন্দনীয় এক ব্যক্তির নির্দোষ ভাই ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করা কত মারাত্মক অপরাধ ।

■ চতূর্থ আঙ্গিক

ব্যক্তি জীবনের বিচারেও এটা অন্যায় । নীচের চারটি নীতি অনুধাবন করো যা হচ্ছে এই চতুর্থ আঙ্গিকের ভিত্তি।

প্রথম নীতি ঃ তুমি যদি তোমার মত ও পথকে সঠিক বলে বিশ্বাস করো তাহলে "আমার পথ সঠিক ও সর্বোত্তম"---একথা বলার অধিকার তোমার আছে ; কিন্তু "একমাত্র আমার পথই সঠিক" একথা তুমি বলতে পারো না । *" সন্তুষ্টির দৃষ্টিতে কোন ত্রুটি ধরা পড়ে না ; রুষ্ট চোখের দৃষ্টিতেই কেবল তা প্রকাশিত হয় "*[৭]--- একথার অর্থ এই যে তোমার বেইনসাফ দৃষ্টিভঙ্গি ও বিকৃত মনোভাব কখনও সকল বিষয়ে সুষ্ঠু বিচার করতে পারে না এবং অন্যের মত ও বিশ্বাসকে বাতিল করতে পারে না ।

দ্বিতীয় নীতি ঃ এ অধিকার তোমার আছে যে তুমি যা কিছু বলবে সত্য বলবে ; কিন্তু এটা নয় যে সব সত্য কথাই তোমাকে বলতে হবে । কারণ কুটিল মনোভাবাপন্ন কেউ তোমার নসিহত হয়তো সাদরে গ্রহণ করবে না ; বরং বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করবে ।

তৃতীয় নীতি ঃ যদি তুমি বৈরীতা পোষণ করতে চাও তবে তা করো তোমার হৃদয়ে লালিত বৈরী স্বভাবের প্রতি ; এবং নিজেকে তা থেকে মুক্ত করতে স্বচেষ্ট হও । বৈরীতা পোষণ করো তোমার কুমন্ত্রণা দাতা আত্মা (নফ্সই-আম্মারা) ও তার ছলনার প্রতি । একে সংশোধন করতে স্বচেষ্ট হও, কারণ অন্য সব কিছু থেকে এটাই সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করে । এই ক্ষতিকর আত্মাটির কারণে মুমিনদের প্রতি বৈরীতা পোষণ করো না । হ্যা, শত্রুতা যদি করতেই হয় তাহলে কাফির যিন্দিক যথেষ্ট আছে ; তাদের বিরোধিতা করো । যেমনিভাবে ভালোবাসার প্রতিদান ভালোবাসার মাধ্যমেই প্রাপ্য, তেমনি বৈরীতাও বৈরীতার মাধ্যমেই তার

---

৭. আলী মাওয়ার্দি, আদাবুদ্দুনিয়া ওয়াদ্দীন ১০
৮. মুতানাবী, *আল উরফ আল তাইয়্যিব ফী শাহর দিওয়ান আল-তায়্যিব* ৩৮৭

প্রতিদান পায় । যদি তোমার শত্রুকে পরাস্ত করতে চাও তবে তার মন্দকে তোমার ভালো দিয়ে মোকাবেলা করো । কারণ যদি তুমি তাকে মন্দ দিয়ে মোকাবেলা করো তাহলে তার বৈরীতা বৃদ্ধি পাবে । যদিও সে আপাতঃ দৃষ্টিতে পরাজিত হয় কিন্তু সে তার হৃদয়ে বিদ্বেষ পোষণ করবে এবং শত্রুতা অব্যহত রাখবে । কিন্তু যদি তাকে ভালো দিয়ে মোকাবেলা করো তাহলে সে অনুতপ্ত হবে এবং তোমার বন্ধু হয়ে যাবে । *"গুনীজনের সাথে ভালো ব্যবহার করলে তারা তোমার আপন হবে কিন্তু ইতরজনের সাথে ভালো ব্যবহার করলে তারা বিদ্রোহ করবে ।"* [৮] এ কথার অর্থ হচ্ছে ঈমানদারগণ যেহেতু মহৎ, তারা মহৎ আচারণ দ্বারাই তোমার অনুগত হবে । আপাতঃ দৃষ্টিতে কাউকে সম্ভ্রান্ত মনে না হলেও সে তার ঈমানের প্রেক্ষিতে সম্ভ্রান্ত হতে পারে । প্রায়শঃই দেখা যায় যে, কোন খারাপ লোককে যদি বার বার বলা হয় "তুমি ভালো, তুমি ভালো", তাহলে সে ভালো হয়ে যায় ; এবং যদি কোন ভালো লোককে যদি বার বার বলা হয় "তুমি খারাপ, তুমি খারাপ, " তাহলে সে খারাপ হয়ে যায় ।

> *"এবং অসার ক্রিয়া কর্মের সম্মুখীন হলে, স্বীয় মর্যাদার সাথে তা পরিহার করে চলে ।"* [৯] *"যদি মার্জনা করো, উপেক্ষা করো, এবং ক্ষমা করো, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল এবং করুণাময় ।"*[১০]

কোরআনের উপরোক্ত পবিত্র নীতিমালা অনুধাবন করো, কারণ এতেই নিহিত রয়েছে শান্তি ও নিরাপত্তা ।

চতুর্থ নীতি ঃ যারা তাদের মনে বিদ্বেষ ও বৈরীতা পোষণ করে তারা নিজেদের প্রতি ও তাদের দ্বীনি ভাইদের প্রতি যুলুম করে এবং ঐশী করুণার বিরুদ্ধে সীমালংঘন করে । কারণ এ ধরনের মানুষ তাদের বিদ্বেষ এবং বৈরীতার দ্বারা নিজ আত্মাকেই বেদনাদায়ক যন্ত্রণায় নিপতিত করে । শত্রুর ভালো কিছু অর্জন তার মনোকষ্টের কারণ হয় এবং শত্রুর ভয় তাকে মানসিক যন্ত্রণায় ফেলে দেয় । বৈরী মনোভাব যদি হিংসার ফলশ্রুতিতে হয়ে থাকে তবে তা হয় মারাত্মক কষ্টের কারণ । কেননা হিংসা প্রথমতঃ হিংসুককে নিঃশেষে ধ্বংস করে ফেলে অথচ যার প্রতি হিংসা করা হয় সে তাতে অল্পই ক্ষতিগ্রস্ত হয় অথবা আদৌ হয় না ।

হিংসা থেকে বাঁচার উপায় ঃ হিংসুকদের চিন্তা করে দেখা উচিত ঐ সমস্ত বিষয়ের শেষ পরিণতির ব্যাপারে যেগুলো তার মনে অন্যের প্রতি বৈরীতার জন্ম দেয় । তাহলে সে অনুধাবন করবে যে, সৌন্দর্য, শক্তি, পদমর্যাদা এবং ধন সম্পত্তি যা তার প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে রয়েছে তা শুধুই অস্থায়ী এবং ক্ষণিক মাত্র । এগুলো থেকে প্রাপ্ত উপকার খুবই সামান্য অথচ এসব যে দুশ্চিন্তার জন্ম দেয় তা অনেক বেশী । কারো ব্যক্তিগত গুণাবলী যা আখেরাতে পুরস্কারের কারণ হবে, সেগুলো হিংসার লক্ষ্যবস্তু হতে পারে না । কিন্তু যদি একারণেই কেউ অন্যকে হিংসা করে তাহলে হয় সে নিজে একজন মুনাফেক যে তার ভাই এর আখেরাতের পুরস্কার দুনিয়াতেই নষ্ট হয়ে যাক---এই কামনা করে ; অথবা সে যার প্রতি হিংসা পোষণ করছে তাকেই মোনাফেক মনে করে । উভয় ক্ষেত্রেই সে তার ভাই এর প্রতি অবিচার করে ।

যদি সে তার ভাই এর দূর্দশায় আনন্দ বোধ করে এবং তার নেয়ামত প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হয় তাহলে সে যেন ঐশী তক্‌দীর এবং করুণার করণে তার ভাই এর প্রাপ্ত রহমতের জন্য মনোকষ্টবোধ করে । এধরনের মনোবৃত্তি ঐশী করুণা এবং তক্‌দীরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিরূপ সমালোচনা করার শামিল । যে কেউ ঐশী তক্‌দীরের বিরূপ সমালোচনা করে, সে যেন শক্ত কোন বস্তুতে তার নিজের মাথা ঠোকে, ফলে তার নিজের মাথাই ফাটে । ঐশী করুণার বিরোধিতাকারী নিজেই তা থেকে বঞ্চিত হয়।

মাত্র একদিনের শত্রুতার যোগ্য এমন বিষয় কি করে সুবিচার এবং সুবিবেচনায় গ্রহণযোগ্য হতে পারে যা কি না এক বছরের বিদ্বেষ এবং বৈরীতার কারণ হতে পারে ? কোন ঈমানদার ভাই তোমার কোন ক্ষতির কারণ হয়ে থাকলে তাকে তুমি দোষারোপ করতে পারো না । কারণ ঃ

---

৯. আল কোরআন ২৫ ঃ ৭২
১০. আল কোরআন ৬৪ ঃ ১৪

প্রথমত, তক্‌দীরের একটা অংশ এতে আছে । এই অংশটা বাদে যা অবশিষ্ট থাকে তার উপর তোমার তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ ।

দ্বিতীয়ত, নফ্‌স ও শয়তানের যে অংশ আছে তাও বাদ দেওয়া উচিৎ । স্বীয় নফ্‌স কর্তৃক পরাজিত কোন ব্যক্তির প্রতি বৈরীতা পোষণ না করে বরং সে আল্লাহর কাছে অনুতপ্ত হোক---এই প্রার্থনা করা উচিৎ ।

তৃতীয়ত, তোমার নিজের নফ্‌সের ত্রুটি বিচ্যুতি যা তুমি দেখোনা বা দেখতে চাও না তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করো এবং তাদের অংশটুকু বাদ দাও । এরপরও যে সামান্য অংশ রয়ে গেল তা মহানুভবতা ও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখো, কারণ যদি তা তোমার শত্রুকে দ্রুত ও নিশ্চিত ভাবে জয় করতে পারে তাহলে তুমিও পাপ এবং ক্ষতি থেকে নিস্কৃতি পাবে । কিন্তু কাঁচ ও বরফের টুকরোকে হীরক মনে করে ক্রয়করী কোন মাতাল ইহুদীর ন্যায় তুমিও যদি এই দুনিয়ার মূল্যহীন, তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী বিষয়ের প্রতি চরম বৈরীতা, স্থায়ী বিদ্বেষ ও চির শত্রুতা পোষণ করো যেন তোমার শত্রুর সাথে তুমিও এ দুনিয়াতে অনন্তকাল বাস করবে, তাহলে তা হবে চরম সীমালংঘন, পাপাচারিতা, মদোন্মত্ততা ও পাগলামী ।

যদি তুমি নিজের কল্যান কামনা করো তাহলে এই ক্ষতিকর বৈরীতা ও প্রতিশোধ পরায়ণতাকে নিজের হৃদয়ে প্রবেশ করতে দিয়ো না । আর যদি এগুলো তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করেই থাকে তাহলে এদের কথায় কান দিও না । শোন তাহলে সত্য দ্রষ্টা হাফিজ-ই-শিরাজী কি বলেন ঃ “দুনিয়া বাদানুবাদযোগ্য কোন পণ্য নয়”। কারণ তা ক্ষণস্থায়ী ও ক্ষয়িষ্ণু বিধায় মূল্যহীন । সমগ্র দুনিয়ার ক্ষেত্রে একথা যদি সত্য হয় তাহলে এটা পরিস্কার যে দুনিয়ার সাধারণ বিষয়াদি কত তুচ্ছ ও মূল্যহীন । হাফিজ আরো বলেন “দো জাহানের শান্তি এই দুটি বিষয়ের মাঝেই নিহিত আছে ঃ মিত্রের প্রতি উদারতা ও শত্রুর প্রতি ক্ষমা ।”

যদি তুমি বলো ঃ “ আমি অপারগ কেননা আমার প্রকৃতির মাঝেই বৈরীতার বীজ সুপ্ত রয়েছে ; আমার উত্যক্তকারীদেরকে এড়িয়ে যেতে আমি অপারগ ।”

এর জবাব ঃ কু-চরিত্র এবং খারাপ মনোবৃত্তির কোন প্রকাশ যদি না ঘটে এবং তোমার কর্মকান্ডের পিছনে যদি খারাপ নিয়ত না থাকে তাহলে তাতে কোন ক্ষতি নেই । যদি তুমি অপারগই হও তাহলে তোমার বৈরীতাও ত্যাগ করতে পারবে না । তোমার ত্রুটিসমূহকে যদি তুমি চিনতে পেরে থাকো এবং অনুধাবন করো যে এগুলো তোমার মাঝে থাকা বান্ছনীয় নয়, তাহলে তোমার জন্য তা হবে এক ধরনের অনুশোচনা ও ক্ষমা প্রার্থনা যা এগুলোর খারাপ পরিণতি থেকে তোমাকে মুক্তি দিবে । প্রকৃতপক্ষে আমারা “পত্রের এই বিষয়টি” এজন্য লিখেছি যাতে এ ধরণের ক্ষমা প্রার্থনার মনোবৃত্তি ও ভালো-মন্দের পার্থক্য করার মানসিকতা তৈরী করা যায় এবং বৈরীতা যে সঠিক নয় এটাই তুলে ধরা যায় ।

একটা অনুধাবনযোগ্য বিষয় ঃ আমি একবার দেখলাম এক ধার্মিক আলেম তার একচোখা দলীয় মতাদর্শের কারণে তার সাথে রাজনৈতিকভাবে দ্বিমতপোষণকারী অন্য একজন আলেমকে এমনভাবে দোষারোপ করলো যেন সে কাফের । অথচ সে অন্য এক মোনাফেকের প্রশংসায় পঞ্চমূখ হলো যে তার সাথে রাজনৈতিকভাবে একমত পোষণ করে । আমি এ ধরনের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার অশুভ পরিণতি প্রত্যক্ষ করে আতঙ্কিত হলাম । আমি বললাম, “আমি শয়তান এবং রাজনীতি থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি, ” এবং সেই সময় থেকে রাজনীতি থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিলাম ।

■ পঞ্চম আঙ্গিক

যদি বলা হয় ঃ "এক হাদীসে আছে ঃ 'আমার উম্মতের মধ্যে মতবিরোধ আল্লাহর রহমত বিশেষ,'[১১] এবং মতবিরোধ থাকা মানেই দলবাজী থাকবে ।

কখনও কখনও অসুস্থ দলবাজীও নির্যাতিত সাধারন শ্রেণীর মানুষকে সমাজের উচু শ্রেণীর নির্যাতনকারীদের থেকে মুক্ত করে, কারণ কোন শহর বা গ্রামের উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ যদি একত্রে হাত মিলায় তাহলে তারা নির্যাতিত সাধারন শেণীর লোকদেরকে ধ্বংস করে ফেলবে । দলবাজী বিরাজমান থাকলে নির্যাতিতরা কোন এক দলের আশ্রয় নিয়ে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে ।

ভিন্ন মতাদর্শের সংঘাত এবং দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের মাধ্যমেও কখনও কখনও সত্য পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশ লাভ করে ।"

জবাব

প্রশ্নের প্রথম অংশে উল্লেখিত বিষয়ে আমাদের বক্তব্য ঃ হাদীসে বর্নিত মতবিরোধ ভালো অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ প্রত্যেক দল নিজেদের প্রচার এবং প্রসারের লক্ষ্যে স্বচেষ্ট হয় । কিন্তু অন্যের মতবাদকে ভূলুণ্ঠিত এবং ধ্বংস করতে চায় না বরং তার পুনর্গঠন এবং উন্নয়ন কামনা করে । মতবিরোধের খারাপ দিকটি এই হাদীস প্রত্যাখান করে, কারণ তা উগ্র দলীয় চেতনায় পরস্পরের ধ্বংস ডেকে আনে ; এবং দা-কুমড়া সম্পর্কের দুটি দল কখনও পরস্পরের প্রতি সুস্থ আচরণ করতে পারে না ।

প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশে উল্লেখিত বিষয়ে আমাদের বক্তব্য ঃ দলবাজী যদি সত্যের খাতিরে হয় তাহলে তা অধিকার আদায়ে স্বচেষ্ট কোন জনগোষ্ঠীর জন্য আশ্রয়স্থল হয় । কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক এবং পক্ষপাতদুষ্ট দলবাজী যা ইদানীং পরিলক্ষিত হচ্ছে তা কেবল এক যালেম ও অবিবেচক জনগোষ্ঠীর আশ্রয়স্থল এবং অবলম্বন হতে পারে । পক্ষপাতদুষ্ট দলবাজীতে লিপ্ত এমন ব্যক্তির কাছে কোন শয়তান এসে যদি তার মতামতকে উৎসাহিত করে এবং তার পক্ষাবলম্বন করে তাহলে সে ব্যক্তি ঐ শয়তানের উপরও আল্লাহর রহমত কামনা করে । কিন্তু তার মতের বিরোধী কোন দলে যদি কোন ফেরেস্তার মত লোকও যোগ দেয় তাহলে পূর্বোক্ত সেই ব্যক্তি---আল্লাহ মাফ করুন---ফেরেস্তাতুল্য লোকেটির উপর অভিশাপ বর্ষণেও কুণ্ঠিত হয় না ।

প্রশ্নের তৃতীয় অংশে উল্লেখিত বিষয়ে আমাদের বক্তব্য ঃ দৃষ্টিভঙ্গির সংঘাত ন্যায় বিচার এবং সত্যের খাতিরে হলে মতভেদটা শুধুমাত্র উপায় উপকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট হয় কিন্তু লক্ষ্য ও মৌলিক উদ্দেশ্য অভিন্ন থাকে । এ ধরনের মতভেদে সত্য তার সকল আঙ্গিকে প্রকাশিত হয় এবং সত্য ও ন্যায়ের লক্ষ্যে কাজ করে । কিন্তু অহংবাদীতা ও প্রচারকামীতার উপর প্রতিষ্ঠিত যালিম নফসে-আম্মারার খাতিরে যা করা হয় এবং দলীয় পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির সংঘাতে যে জিনিসটি বেরিয়ে আসে তা সত্যের আলো নয় বরং বিরোধের অনল । লক্ষ্যের অভিন্নতার প্রয়োজন আছে, কিন্তু এ ধরনের পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি দুনিয়ার কোথাও এক বিন্দুতে মিলিত হতে পারে না । তাদের মতবিরোধ যেহেতু সত্যের খাতিরে নয় তাই এই বিরোধ বৃদ্ধি পেতেই থাকে এবং এর ফলে সৃষ্ট ভিন্নমুখিতাকে কখনই সমন্বয় করা সম্ভব হয় না ।

মূল-কথা ঃ "আল্লাহর জন্যই অনুরাগ, আল্লাহর জন্যই বিরাগ এবং আল্লাহর জন্যই বিচার-মীমাংসা"[১২]---এই সমুন্নত নীতিমালা ব্যক্তি আচারণে প্রতিফলিত না হলে তা বিরোধ ও বিদ্বেষ জন্ম দিবে । "আল্লাহর জন্যই বিরাগ এবং আল্লাহর জন্যই বিচার-মীমাংসা"---এ কথা যে না মানে এবং তদোনুযায়ী আচরণ না করে তবে তার কর্মকাণ্ডে ন্যায় বিচারের পরিবর্তে যুলুম প্রতিষ্ঠিত হবে।

---

১১. আল অজলুনি, *কাশফ্ আল খাফা,* i, ৬৪, আল মানাভী, *ফায়েয আল কাদির,* i, ২১০-১২

১২. *বুখারী,* ঈমান ১, *আবু দাউদ,* সুন্না ২

গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক ঘটনা ঃ একদা হযরত আলী (রাঃ) এক কাফের কে ধরাশায়ী করে তাকে হত্যা করার জন্য যখন তরবারী উত্তোলন করলেন, কাফেরটি তাঁর মুখমন্ডলে থুতু নিক্ষেপ করলো। তিনি তাকে হত্যা না করে ছেড়ে দিলেন । কাফেরটি তাঁকে বললো, "আপনি আমাকে হত্যা করলেন না কেন ? " উত্তরে তিনি বললেন, "তোমাকে যে আমি হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলাম, তা ছিল আল্লাহর জন্য । কিন্তু যখন তুমি আমার প্রতি থুতু নিক্ষেপ করলে, আমি রাগান্বিত হলাম এবং এতে আমার নফ্সের অংশ জড়িত থাকার কারণে আমার নিয়তের বিশুদ্ধতা কলুষিত হলো । এ কারণেই আমি তোমাকে হত্যা করিনি ।" জবাবে কাফেরটি বললো, "আপনার দ্বীন যদি হয় এমন বিশুদ্ধ ও নিঃস্বার্থ, তাহলে তা নিশ্চয়ই সত্য দ্বীন ।"

প্রনিধানযোগ্য এক ঘটনা ঃ একদা এক চোরের হস্ত কর্তনের সময় হাকিমের চেহারায় ক্রোধের লক্ষণ দেখে ন্যায় পরায়ণ আমীর তাকে বরখাস্ত করেন । কারণ আল্লাহর কানুন শরীয়াহ্‌র নামে হস্ত কর্তন করলে হাকিমের মনে করুণার উদ্রেক হতো ; তার আচরণে ক্রোধ বা দয়া কোনটাই প্রতিফলিত হতো না । যেহেতু হাকিমের আচরণে তার নফ্সের একটা অংশ জড়িত ছিল তাই তার কর্মে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়নি ।

এমন এক দঃখজনক সামাজিক অবস্থা ও জনজীবন আক্রমণকারী এক ভয়াবহ রোগ, ইসলামের হৃদয়কে কাঁদাতে যা যথেষ্ট ঃ বহিঃশত্রু এসে যখন আক্রমণ করে তখন অভ্যন্তরীন কলহ ভুলে গিয়ে পারস্পরিক বৈরীতা পরিহার করতে হয়। সমাজকল্যানের এটাই দাবী যা আদিম মানুষরাও জানতো ও তাদের সমাজে প্রচলিত ছিল । ইসলামী সমাজকর্মী দাবীদারদের তাহলে কি হলো যে, তারা নিজেদের তুচ্ছ বিভেদ ভুলে শত্রু আক্রমণ মোকাবেলায় সুরক্ষিত ক্ষেত্র রচনায় নিস্ক্রয় অথচ অগণিত শত্রু একের পর এক আক্রমনাত্মক অবস্থান গ্রহণ করে চলেছে ? ইসলামী সমাজ জীবনের বিরুদ্ধে এ যেন এক বিশ্বাসঘাতকতা, এক লজ্জাকর বর্বরতা ।

বিবেচনাযোগ্য এক কাহিনী ঃ এক যাযাবর উপজাতির নাম হাসানান । হাসানান উপজাতির দুটি গোত্র পরস্পরের প্রতি বৈরীতা পোষণ করতো । যদিও পারস্পরিক বৈরীতার কারণে এদের প্রত্যেক পক্ষেই প্রায় পঞ্চাশজন মত নিহত হয়েছে কিন্তু যখনই অন্য কোন উপজাতি, যেমন সিবগান বা হায়দারান, তাদেরকে আক্রমণ করতে আসে, হাসনানের এই দুই বৈরী গোত্র নিজেদের মধ্যে বৈরীতা ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে আক্রমণকারী উপজাতিকে হঠিয়ে না দেয়া পর্যন্ত কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং এসময় তারা নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিরোধের কথা একটিবারও স্মরণ করে না ।

হে মুমিনবৃন্দ ! তোমরা কি জানো শত্রুর কত দল ঈমানদারদেরকে আক্রমণ করতে ওৎ পেতে বসে আছে ? সমকেন্দ্রীক বৃত্তাকারে অবস্থান গ্রহনকারী এসব দলের সংখ্যা শতাধিক । এমতাবস্থায় মুমিনদের প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান সুদৃঢ় করতে হবে, এগিয়ে আসতে হবে একে অন্যের সমর্থনে, বাড়িয়ে দিতে হবে সাহায্যের হাত । তাহলে এটা কি ঈমানদারদের সাজে যে তারা নিজেদের পক্ষপাতদুষ্ট দলবাজী ও বিদ্বেষ দ্বারা শত্রু আক্রমণকে সহজতর করবে ? শত্রুর জন্য কি দ্বার উন্মুক্ত করবে যার ভিতর দিয়ে সে ইসলামের অভ্যন্তরে সবলে প্রবেশ করবে ? নাস্তিক, পথভ্রষ্ট, কাফির ইত্যাদিসহ শত্রুদের হয়তো সত্তুরটি বৃত্ত তোমাদেরকে ঘিরে আছে । এদের প্রত্যেকেই তোমাদের জন্য দুনিয়ার সকল ভীতি এবং দূর্দশার মত ক্ষতিকর, এরা সবাই তোমাদের দিকে লোভ, ক্রোধ ও ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে । এদের সকলের বিরুদ্ধে তোমাদের একমাত্র মজবুত অস্ত্র, ঢাল ও দূর্গ হচ্ছে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব । তাহলে নিশ্চয় এটা অনুধাবন করতে পারবে যে, সামান্য বিদ্বেষ ও অন্যান্য তুচ্ছ অজুহাতে ইসলামের দূর্গের ভিত্তিকে দূর্বল করা বিবেক-বুদ্ধি ও ইসলামী স্বার্থের কতইনা পরিপন্থী । অতএব বিষয়টি অনুধাবন করে নিজ চৈতন্যে ফিরে এসো !

নবী করিম (সাঃ) এর হাদিস শরীফে আছে যে, শেষ জামানায় সুফিয়ান এবং দাজ্জালের মত দুষ্টু ও ভয়ংকর লোক নাস্তিক্যবাদী দুনিয়াকে শাসন করবে । মানবজাতি ও মুসলমানদের মাঝে বিরাজমান লোভ, বিরোধ ও বিদ্বেষী মনোভাবের সুযোগ নিয়ে সামান্য শক্তি দিয়েই মানব সমাজে অরাজকতা সৃষ্টি করবে এবং ইসলামী দুনিয়াকে ক্রীতদাসে পরিণত করবে ।

হে ঈমানদারগণ ! যদি তোমরা এই অবমাননাকর দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ হতে না চাও তাহলে নিজ চৈতন্যে ফিরে এসো এবং আশ্রয় গ্রহণ করো "*মুমিনরাতো পরস্পর ভাই ভাই* "[১৩]--- এই আয়াতের দূর্গে এবং নিজেদের প্রতিরক্ষা মজবুত করো ঐসব যালেমদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের পারস্পরিক বিভেদের সুযোগ নিতে চায় ! অন্যথায়, না পারবে তোমরা নিজেদের অধিকারকে সংরক্ষণ করতে, না পারবে নিজেদের জীবন রক্ষা করতে । এটা পরিস্কার যে, দুই মল্লযোদ্ধা পরস্পরের মধ্যে যখন কুস্তিরত থাকে তখন একটা সামান্য বালকও তাদেরকে পরাজিত করতে পারে । দুটি পাহাড়কে যদি দাঁড়িপাল্লায় সমান করা হয় তাহলে একটি সামান্য নুড়ি পাথরও তাদের মধ্যেকার সমতা বিনষ্ট করে একটিকে উপরে তুলে অন্যটিকে নীচে ফেলে দিতে পারে । তাহলে হে ঈমানদারগণ ! পক্ষপাতদুষ্ট দলাবাজী ও অন্ধ আবেগ তোমাদের শক্তি নিঃশেষ করে ফেলে এবং সামান্যতম শক্তিও তেমাদেরকে পরাজিত করার জন্য হয় যথেষ্ট । জামাতবদ্ধ যিন্দেগীর প্রতি যদি তোমাদের আগ্রহ থাকে তবে---"*মুমিনরা ঐক্যবদ্ধভাবে একটি মজবুত ইমারতের ন্যায়, যার এক অংশ অন্য অংশের ভার বহন করে।*"[১৪]---আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর এই মহান বাণীকে তোমাদের জীবনের পথনির্দেশ হিসেবে গ্রহণ করো । তাহলে তুমি দুনিয়ার জীবনে দূর্দশা এবং আখেরাতের দুরাবস্থা থেকে মুক্তি পাবে ।

■ ষষ্ঠ আঙ্গিক

বিদ্বেষ ও বৈরীতার কারণে আধ্যাত্মিক জীবন এবং ইবাদতের সুষ্ঠুতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় ; কারণ তাতে নিয়তের বিশুদ্ধতা---যা হচ্ছে নাজাতের একমাত্র উপায়---তা নষ্ট হয়ে যায় । কারণ পক্ষপাতদুষ্ট ব্যক্তি তার প্রতিপক্ষের সৎআমলকে শুধুমাত্র বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে ছাড়িয়ে যেতে চায় ; ফলে সে তার সৎআমল আল্লাহর উদ্দেশ্যে সম্পন্ন করতে সমর্থ হয় না । সে তার নিজ বিচার বিবেচনা ও কর্মকান্ডে এমন ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিতে চায় যে তার পক্ষ অবলম্বন করে ; ফলে সে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে অপারগ হয় । তাই বিদ্বেষ ও বৈরীতার কারণে বরবাদ হয়ে যায় ন্যায়বিচার ও নিয়তের বিশুদ্ধতা---যা হচ্ছে সৎকর্মকান্ডের বুনিয়াদ ।

ষষ্ঠ আঙ্গিক অত্যন্ত জটিল এবং এখানে তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার অবকাশ নেই বিধায় বিষয়টি এখানেই সমাপ্ত করা হলো ।

১৩. আল কোরআন ৪৯ ঃ ১০
১৪. *বুখারী,* সালাত ৮৮, *মুসলিম,* বির্ ৬৫, *তিরমিয,* বির্ ১৮

দ্বিতীয় বিষয়

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

> *"আল্লাহতায়ালাই তো রিয্কদাতা, শক্তির আধার, পরাক্রান্ত ।"[১৫] "এমন কতো জীবজন্তু আছে যারা নিজেদের খাদ্য মজুদ রাখে না । আল্লাহতায়ালাই রিয্ক দান করেন তাদেরকে ও তোমাদেরকে ; এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ ।" [১৬]*

হে ঈমানদারগণ ! এতক্ষণে নিশ্চয় তুমি বুঝতে পেরেছো বৈরীতা কতোটা ক্ষতিকর । একথাও বুঝে নাও যে লোভ আরেকটি ভয়ংকর রোগ যা ইসলামী জিন্দেগীর জন্য বৈরীতার মতই ক্ষতিকর । লোভ নিয়ে আসে হতাশা, অভাব ও অপমান ; এটা দূর্দশা ও বঞ্চনার কারণ । দূর্দশা ও বঞ্চনায় পতিত ইহুদী জাতি, যারা অন্য যে কোন জাতির চেয়ে বেশী লোভী, তারাই উপরোক্ত সত্যের চুড়ান্ত প্রমাণ । একান্ত ব্যক্তি পর্যায় থেকে সার্বজনীন পর্যায় পর্যন্ত জীব জগতের সর্বত্র লোভের কূ-প্রভাব দৃষ্টিগোচর হয় । অন্যদিকে আল্লাহর উপর ভরসা করে নিজের রিয্ক অন্বেষণ করলে তা শান্তি বয়ে আনে এবং সর্বত্র তার সু-প্রভাব পরিলক্ষিত হয় ।

অতএব ফলবতী বৃক্ষ ও লতাগুল্ম, যেহেতু তাদের রিয্কের প্রয়োজন আছে, তাই তারাও প্রাণীজগতের বিভিন্ন প্রজাতির অন্তর্ভূক্ত । অথচ তারা সন্তুষ্টচিত্তে নিজ অবস্থানে দাঁড়িয়ে থেকে নির্লোভ ভাবে নিজের রিয্কের জন্য আল্লাহর উপর ভরসা করে । ফলে তাদের রিয্ক দ্রুত তাদের নিকট পৌছে যায় । জীবজন্তুর অনুপাতে এদের বংশবৃদ্ধির হারও অনেক বেশী । অন্যদিকে, জীবজন্তু লোভাতুরভাবে তাদের রিয্ক অন্বেষণ করে, ফলে তারা সকল প্রচেষ্টা সত্বেও পরিপূর্ণ রিয্ক অর্জনে অ-সমর্থ থেকে যায় । প্রাণীজগতে শুধুমাত্র শিশুরাই তাদের প্রয়োজনীয় পূর্ণ সুষম খাদ্য ঐশী করুণার ভান্ডার থেকে প্রাপ্ত হয়, কেননা তারা নিজেদের দুর্বলতা এবং অক্ষমতার মাধ্যমেই যেন আল্লাহর উপর ভরসা করে। কিন্তু হিংস্র জন্তুরা লোলুপভাবে তাদের শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং অনেক প্রচেষ্টার বিনিময়ে অবৈধ ও নিকৃষ্ট খাদ্য আহরণে সমর্থ হয় । এই দুটি উদাহরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে লোভ হচ্ছে বঞ্চনার কারণ, অথচ আল্লাহর উপর ভরসা এবং আত্মসন্তুষ্টিই হচ্ছে তাঁর করুণালাভের উপায় ।

মানবজগতে ইহুদী জাতি অন্য যে কোন জাতির চেয়ে বেশী লোভের সাথে এই দুনিয়াকে আঁকড়ে থেকেছে এবং দুনিয়ার এই জীবনকেই তারা বেশী ভালোবেসেছে । কিন্তু সুদী-ধন যা তারা অনেক কষ্টে অর্জন করেছে তা কেবলই অবৈধ । সম্পদের উপর তাদের এই মালিকানা অস্থায়ী এবং তা তাদের অল্পই উপকারে আসে । পক্ষান্তরে অন্যান্য জাতি সমূহ তাদের উপর দূর্দশা ও অবমাননা এবং মৃত্যু ও অপমানের আঘাত নিক্ষেপ করে ।[#] এতে একথাই প্রতীয়মান হয় যে লোভই সকল অপমান ও ক্ষতির উৎস। এছাড়াও লোভী মানুষের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার এত উদাহরণ রয়েছে যে, "লোভীরাই ক্ষতি এবং নৈরাশ্যে পতিত"---এই সত্যটি সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করেছে । এই যদি হয় বাস্তবতা, তবে সম্পদ পেতে চাইলে লোভাতুরভাবে নয় বরং আত্মতৃপ্তির মাধ্যমেই তা অন্বেষণ করো, যাতে তুমি তা পর্যাপ্ত পেতে পারো ।

এক আত্মতৃপ্ত ও এক লোভী ব্যক্তির উদাহরণ ঐ দুই ব্যক্তির ন্যায় যারা এক মহান ব্যক্তিত্বের দরবারে উপস্থিত হয় । তাদের

---

১৫. আল কোরআন ৫১ ঃ ৫৮
১৬. আল কোরআন ২৯ ঃ ৬০

বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে লেখক ইহুদীদের সম্পর্কে এই মন্তব্য করেন । তখন তারা ফিলিস্তিনসহ পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে ভাসমান অবস্থায় ছিল । আমেরিকা ও বৃটেনের প্রত্যক্ষ দয়া ও মদদে বর্তমান ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়---অনুবাদক

একজন স্বগোতক্তি করে, "তিনি যদি আমাকে বাইরের ঠান্ডা থেকে বাঁচার জন্য শুধু ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেন সেটাই আমার জন্য যথেষ্ট । আর তিনি যদি কোন নিকৃষ্টতম আসনে বসার জন্য আমার প্রতি ইংগিত করেন তাহলে আমি এটাকেই আমার প্রতি তাঁর মহানুভবতা হিসেবে মনে করবো ।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি উদ্ধতভাবে বলে, "আমাকে সর্বোচ্চ আসনটিই দিতে হবে," যেন এটা তার অধিকার এবং সবাই তাকে সম্মান করতে বাধ্য । লোভাতুর দৃষ্টি নিয়ে সে প্রবেশ করে এবং সর্বোচ্চ আসনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সেদিকে অগ্রসর হয় । কিন্তু দরবার অধিপতি তাকে ফেরৎ পাঠিয়ে নিম্ন আসনে বসতে ইংগিত করেন । দরবার অধিপতিকে ধন্যবাদ জনানোর পরিবর্তে---যা তার উচিৎ ছিল---সে তিনি হৃদয়ে উষ্ণা পোষণ করে এবং তাঁর সমালোচনা করে । রাজপ্রাসাদের মালিক এতে শুধু অসন্তুষ্টই হবেন।

প্রথম ব্যক্তি বিনয়ের সাথে প্রবেশ করে এবং সর্বনিম্ন আসনে বসতে চায় । দরবার অধিপতি এতে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে একটি উচ্চতর আসনে বসার আমন্ত্রণ জানায় । এতে তার কৃতজ্ঞতা আরো বৃদ্ধি পায় ।

অনুরূপভাবে এ দুনিয়া যেন পরমকরুণাময়ের এক সাজানো দরবারের মত । এই ভূ-পৃষ্ঠ যেন তাঁর করুণায় সাজানো এক মহা ভোজসভা । এখানে পরিবেশিত খাদ্য সামগ্রী এবং অন্যান্য নেয়ামত দরবার কক্ষের আসনের মর্যাদার অনুপাতে সাজানো ।

এছাড়া ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাপারেও যে কেউ লোভের কু-প্রভাব অনুভব করতে পারে । যেমন, যখন দুজন ভিক্ষুক কারো কাছে কিছু চায় তখন যে ভিক্ষুকটি লোভাতুরভাবে চাইতে থাকে তার ভিক্ষার আবেদন প্রত্যখ্যাত হয় অথচ যে শান্তভাবে কিছু চায় তার উপর করুণার উদ্রেক হওয়ায় তার চাহিদা পূরণ হয় এবং সে যা চায় তা তাকে দেওয়া হয় ।

এরূপ আরেকটা উদাহরণ দেওয়া যাতে পারে । যখন রাত্রে তোমার ঘুম আসে না অথচ তুমি ঘুমাতে চাও, তখন তুমি সফল হবে যদি ঘুমের আকাংখায় উদ্বিগ্ন না হও । কিন্তু তুমি যদি প্রবলভাবে ঘুমের আকাংখা করতে থাকো এবং বলতে থাকো, "আমার ঘুম আসুক, আমার ঘুম আসুক," তাহলে ঘুম তোমাকে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করবে ।

তাছাড়া আরও একটি উদাহরণ এই যে, যদি কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে কারো আগমনের জন্য তুমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকো এবং অবিরাম বলতে থাকো ঃ "সে এখনও এলো না," পরিশেষে ধৈর্য্যচুত হয়ে উঠে চলে যাও অথচ এক মিনিট পরেই ঐ ব্যক্তি আসবে এবং তোমার উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে ।

এসব কিছুর কারণ এরকম ঃ একটি পাউরুটি প্রস্তুত করতে জমি চাষ করে ফসল ফলাতে হয়, এবং শস্যদানা মিলে নিয়ে ভাঙ্গাতে হয় তারপর পাউরুটি বানিয়ে তা চুল্লীতে সেঁকতে হয় । তেমনি প্রত্যেকটি জিনিসের ব্যবস্থাপনায় আল্লাহর হিকমতের ধীর স্থির বিবেচনা প্রসূত হুকুম কার্যকর হয় । যদি কেউ লোভের বশবর্তী হয়ে তার কর্মকান্ডে স্থির বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে প্রত্যেক জিনিসের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার যে সিঁড়িগুলো পর্যায়ক্রমে অতিক্রম করা প্রয়োজন তা তার নজর এড়িয়ে যায় ; ফলে সে হয় হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় অথবা সে সিঁড়িগুলো অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয় । ফলে উভয় ক্ষেত্রেই সে তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয় ।

হে ভ্রাতৃবৃন্দ, তোমরা যারা জীবিকা অন্বেষণে ব্যস্ত, এবং দুনিয়ার লোভে আসক্ত ! লোভতো অনিষ্টকর ও অপকারী । তাহলে এটা কেমন যে তুমি তোমার লোভের কারণে সবধরনের হীনকাজ করো ? বৈধ অবৈধ বিবেচনা না করে সকল প্রকার সম্পদ গ্রহণ করার ফলে তোমার আখেরাতের অধিকাংশই বরবাদ হয়ে যায় । তোমার এরূপ লোভের কারণে তুমি যাকাত দেয়াও পরিত্যাগ করো । অথচ যাকাত হচ্ছে ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ যা প্রত্যেকের জন্য দূর্ভাগ্যকে ঠেলে দিয়ে নেয়ামত বয়ে আনে । যে যাকাত প্রদান করে না সে

নিশ্চিতভাবে ঐ পরিমান অর্থ হারাবে যা সে যাকাত হিসেবে দান করতো ঃ হয় সে তা কোন বাজে কাজে ব্যয় করবে অথবা কোন দূর্ভাগ্যে পতিত হওয়ার কারণে সেই অর্থ তার কাছ থেকে চলে যাবে ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পঞ্চম বর্ষে এক সত্য স্বপ্নে আমাকে নিম্নের প্রশ্নগুলো করা হয় ঃ

> "এই যে ক্ষুধা, আর্থিক ক্ষতি এবং দুঃখ-দূর্দশা যা আজ মুসলমানদেরকে জর্জরিত করছে তার কারণ কি ?"

স্বপ্নে আমি উত্তর দিলাম ঃ

"আমাদেরকে যে ধন সম্পত্তি দেওয়া হয় তার দশ ভাগের এক ভাগ অথবা চল্লিশ ভাগের এক ভাগ[১৭] আল্লাহ আমাদের কাছ থেকে নিতে চান যাতে আমরা দরিদ্রদের কৃতজ্ঞ দোয়া থেকে উপকার লাভ করতে পারি এবং হিংসা বিদ্বেষকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি । কিন্তু আমরা লোভ এবং লালসার বশবর্তী হয়ে *যাকাত* দিতে অস্বীকার করেছি, ফলে সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের নিকট থেকে ত্রিশ ভাগের এক ভাগ নিয়ে নিলেন যেখানে চল্লিশ ভাগের এক ভাগই যথেষ্ট ছিল ; এবং আট ভাগের এক ভাগ নিয়ে নিলেন যেখানে দশ ভাগের এক ভাগই যথেষ্ট ছিল

"আল্লাহ চাইলেন আমরা বছরে যেন একমাস ক্ষুধা সহ্য করি যার সত্তরটি উপকারী উদ্দেশ্য রয়েছে । কিন্তু আমরা আমাদের নফ্সের প্রবৃত্তির প্রতি করুণার বশবর্তী হয়ে সেই ক্ষণস্থায়ী সুখকর ক্ষুধা সহ্য করিনি । সর্বশক্তিমান আল্লাহ তখন আমাদেরকে পাঁচ বছর ক্ষুধার কষ্ট ভোগে বাধ্য করে শাস্তি প্রদান করলেন, যে ক্ষুধা সত্তর ধরনের দূর্দশা জর্জরিত ছিল ।

"তিনি আমাদের কাছে এও চাইালন যে আমরা যেন প্রত্যেক চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মাত্র একটি ঘন্টা মনোরম ও মহান, নূরাণী ও উপকারী এক ঐশী অনুশীলনে ব্যয় করি । কিন্তু আমাদের অলসতার কারনে আমরা নামাজ আদায়ে অবহেলা করেছি । সেই একটি ঘন্টা অন্য আর সব ঘন্টার সাথে একত্রিত হয়ে অপব্যয়িত হয়েছে । শাস্তি স্বরূপ সর্বশক্তিমান আল্লাহ নামাজের পরিবর্তে অন্য একধরনের অনুশীলন এবং শারীরিক পরিশ্রম করতে আমাদেরকে বাধ্য করলেন ।"

আমি জাগ্রত হলাম এবং চিন্তা করে বুঝতে পারলাম যে স্বপ্নটির মাঝে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ সত্য নিহিত আছে । পঁচিশতম কালিমাতে[*] কোরআনের নীতিমালার সাথে আধুনিক সভ্যতার তুলনাকালে যেমনটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে, মানুষের সামাজিক জীবনের সকল অনৈতিকতা এবং অশ্লীলতা দুটি উৎস থেকে উৎসরিত হয় ।

প্রথমটি ঃ "যতক্ষন আমার উদর পূর্ণ, অন্যেরা ক্ষুধায় মারা গেলে
আমার তাতে কি ? "

দ্বিতীয়টি ঃ "তুমি কাজ করেবে আর আমি বসে বসে খাবো "

---

১৭. যাকাতের বিধান অনুযায়ী দশ ভাগের এক ভাগ নূতন ফসলের জন্য অথবা চল্লিশ ভাগের এক ভাগ এক বছরের উদ্বৃত্ত ধন-সম্পদের জন্য প্রদেয়

* বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী (রহঃ) লিখিত Words নামক গ্রন্থের পচিশতম অধ্যায়

একদিকে সূদের প্রচলন এবং অন্যদিকে যাকাত না দেওয়ার প্রবণতার কারণে উপরোক্ত দুটি বিষয় সমাজে স্থায়িত্ব লাভ করে । এই দুটি ভয়ংকর সামাজিক ব্যধির একমাত্র নিরাময় নিহিত রয়েছে বিশ্বজনীন নীতি হিসেবে যাকাত কায়েম করা এবং সুদকে নিষিদ্ধ করার মধ্যে । শুধুমাত্র ব্যক্তি এবং বিশেষ সমাজের জন্যই নয় বরং সমগ্র মানবতার সুখ স্বাচ্ছন্দের মূলেই রয়েছে যাকাত ব্যবস্থা। মানুষ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ উচ্চবিত্ত শ্রেণী এবং সাধারণ শ্রেণী । একমাত্র যাকাতই পারে সাধারণ শ্রেণীর জন্য উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মনে উদারতা ও সহানুভূতির উদ্রেক করতে এবং উচ্চবিত্তের প্রতি সাধারণ শ্রেণীর মনে সম্মান ও আনুগত্যের মনোভাব জন্ম দিতে । যাকাত ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে উচ্চবিত্ত শ্রেণী নিষ্ঠুরতা ও যুলুমের মনোভাব নিয়ে সাধারণ শ্রেণীর উপর চেপে বসবে এবং সাধারণ শ্রেণী উচ্চবিত্তের বিপক্ষে বিদ্বেষ ও বিদ্রোহের মনোভাব নিয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে । ফলে এই দুটি শ্রেণীর মধ্যে অবিরাম সংঘাত ও স্থায়ী বিরোধ অব্যাহত থাকবে । অবশেষে তা পুঁজি ও শ্রমের সংঘর্ষে পরিণত হবে যেমনটা হয়েছিল রাশিয়াতে ।

হে মহানুভব এবং বিবেকবান মানুষ ! হে উদার এবং দয়ালু মানুষ ! যাকাতের নামে এই উদার কর্মকান্ড সম্পাদিত না হলে তাতে তিনটি কু-ফল দৃষ্টিগোচর হয় । যাকাত দান নিস্ফল হয় কারণ আল্লাহর ওয়াস্তে না দেওয়ার ফলে কার্যতঃ তা শুধু হতভাগা কিছু ফকিরকে বাধ্যবাধকতার শীকলে আবদ্ধ করে । ফলে তুমি বঞ্চিত হবে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য তাদের এই দোয়া থেকে । বাস্তবে তুমি আল্লাহর নেয়ামত, তাঁর বান্দাদের মাঝে বিতরনের দায়িত্বপ্রাপ্ত এক কর্মচারী বৈ নও । কিন্তু যদি তুমি নিজেকে এই সম্পদের মালিক বলে বিবেচনা করো তাহলে তা হবে এই প্রাপ্ত নেয়ামতকে অস্বীকার করার সামিল । অপরদিকে যদি তুমি যাকাতের নামে দান করো তাহলে তা আল্লাহর ওয়াস্তে দান করার কারণে নেকী বয়ে আনবে ; ফলে তা তোমার জন্য আল্লাহর শোকর-গোজার করার কারণ হতো । অভাবী ব্যক্তিটিকেও তোমার সামনে হীনভাবে তোষামোদ করতে বাধ্য হতে হতো না ; তার আত্মসম্মানবোধ ক্ষুন্ন হতো না, এবং তোমার জন্য তার দোয়া কবুল হতো । তাহলে দেখো দুটি বিষয়ের পার্থক্য কত বিশাল ঃ একদিকে যাকাত---যা দেয়ার তা দান করা হলো কিন্তু যাকাতের নামে না দেয়ার কারণে মোনাফেকীর ক্ষতি, খ্যাতি অর্জন এবং দান গ্রহীতাদের উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা ছাড়া কোন কিছুই অর্জিত হলো না ; এবং অপরদিকে একই কাজ যাকাতের নামে সম্পাদিত হলে তা হয় একটি দায়িত্ব পালন করা, যার মাধ্যমে পুরস্কার, ইখলাসের গুণ এবং দান গ্রহীতাদের দোয়াও অর্জিত হয় ।

তুমি পবিত্র, আমরা কোন কিছুই জানিনা, তবে তুমি যা আমাদেরকে শিখিয়েছ (সেগুলো ব্যতীত) । নিশ্চয় তুমিই প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন, হিকমতওয়ালা ।[১৮] *হে আল্লাহ ! সালাম ও শান্তি বর্ষণ করুন আমাদের নেতা মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর যিনি বলেছেন, " মুমিনরা ঐক্যবদ্ধভাবে একটি মজবুত ইমারতের ন্যায়, যার এক অংশ অন্য অংশের ভার বহন করে ।"*[১৯] *যিনি এ কথাও বলেছেন যে, "আত্মতৃপ্তি এমন এক ধনভান্ডার যা কখনই নিঃশেষ হয় না ।"*[২০] *এবং সালাম ও শান্তি বর্ষণ করুন তাঁর পরিবার ও সাহাবীদের উপর । সকল প্রশংসা জগৎসমূহের রব আল্লাহর জন্য ।*

১৮. আল কোরআন ২ ঃ ৩২
১৯. *বুখারী,* সালাত ৮৮, *মুসলিম,* বির্ ৬৫, *তিরমিয,* বির্ ১৮
২০. সয়ুতি, *ফাত্হুল কবীর* ii, ৩০৯

উপসংহার
গীবত সংক্রান্ত

তাঁর নামে ।

এবং এমন কিছুই নেই যা তাঁকে প্রশংসার মাধ্যমে মহিমান্বিত না করে ।

পঁচিশতম কালিমার প্রথম আলোর প্রথম রশ্মির পঞ্চম পয়েন্টে এটাই দেখানো হয়েছে যে কোরআনের নিরুদ্যম ও সংযতকারী একটিমাত্র আয়াত কেমন করে ছয়টি অলৌকিক উপায়ে গীবতের প্রতি বীতশ্রদ্ধার জন্ম দেয় । এটাও দেখানো হয়েছে যে কোরআনের দৃষ্টিতে গীবত কত জঘন্য ; আর তাই এ বিষয়ে আর কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন থাকে না । বস্তুতঃ কুরআনের ঘোষণা যেখানে স্পষ্ট, সেখানে আর কিছুর সম্ভাবনাও থাকে না, প্রয়োজনও নেই ।

أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا

"তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভায়ের গোশ্‌ত ভক্ষণ করা পছন্দ করবে ?"[২১]

উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে কোরআন ছয়ভাবে গীবতকারীকে ভর্ৎসনা করে এবং তাকে ছয়টি কঠোর স্তরের মাধ্যমে এই পাপকার্য করতে নিষেধ করে । যখন এই আয়াত গীবতে লিপ্ত ব্যক্তিবর্গের প্রতি নির্দেশিত হয় তখন তার অর্থ হয় নিম্নরূপ ঃ

এটা সর্বজনবিদিত যে আয়াতটির শুরুতে *হামযা* (ء) প্রশ্নবোধক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । এই প্রশ্নবোধক ভাবটি এই আয়াতের প্রত্যেকটি শব্দের মাঝে পানির মত গভীরে অনুপ্রবেশ করে । ফলে প্রত্যেকটি শব্দেই একটি বাড়তি অর্থ প্রকাশিত হয় ।

অতএব প্রথম শব্দটি তার ***হামযার*** (ء) মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করে ঃ "তোমার কি ভালো-মন্দ বিবেচনাবোধ নেই যে তুমি এই বিষয়টির কুৎসিত দিকটি অনুধাবনে ব্যর্থ হও ?"

দ্বিতীয় শব্দটি ***পছন্দ*** (يُحِبُّ) জিজ্ঞাসা করে "তোমার হৃদয় যা কি না ভালোবাসা ও ঘৃণার আধার তা কি এতই কলূষিত যে সবচেয়ে ঘৃণ্য বস্তুকেই তা পছন্দ করে ? "

তৃতীয় শব্দটি ***তোমাদের মধ্যে কেউ*** (أَحَدُكُمْ) জিজ্ঞাসা করে "তোমার সভ্যতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধের কি হলো যে, তুমি সামাজিক জীবনের প্রতি বিষৎ একটা জিনিসকে গ্রহন করতে পারো ?"

চতূর্থ শব্দটি ***গোশত্ ভক্ষণ করা*** (أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ) জিজ্ঞাসা করে "তোমার মানবতাবোধের কি হলো যে, তুমি বন্য প্রাণীর ন্যায় হিংস্র নখর দ্বারা তোমার বন্ধুকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেল? "

পঞ্চম শব্দটি ***তার ভাই*** (أَخِيهِ) জিজ্ঞাসা করে "তোমার কি কোন জ্ঞাতিভাব এবং আত্মীয়তাবোধ নেই ? তুমি কি করে এমন এক হতভাগ্য ব্যক্তির উপরে নিজের দাঁত বসিয়ে দাও যে ভ্রাতৃত্বের অগণিত সূত্রে তোমার সাথে বাঁধা ?"

---

২১. আল কোরআন ৪৯ ঃ ১২

ষষ্ঠ শব্দটি **মৃত** (مَيْتًا) জিজ্ঞাসা করে "তোমার বিবেক কোথায় গেল ? তোমার প্রকৃতি কি এতই কলূষিত যে, তুমি সকল সম্ভ্রম পরিত্যাগ করে তোমার ভায়ের মাংস ভক্ষণ করার মত ঘৃণ্য আচরণ করো ?"

সমগ্র আয়াতটির ভাবার্থ এবং এর প্রত্যেকটি শব্দ এই ইংগিত দেয় যে কূৎসা ও গীবত হচ্ছে অন্তর ও বুদ্ধি, মানবতা ও বিবেক এবং প্রকৃতি ও সামাজিক সচেতনতার পরিপন্থী ।

তাহলে তুমি দেখতে পাচ্ছো যে এই আয়াতটি ছয়টি অলৌকিক স্তরের মাধ্যমে, ছয়টি অলৌকিক উপায়ে মানুষকে গীবতে লিপ্ত হতে বাধা দেয় । জিদ, হিংসা ও বিদ্বেষপূর্ণ মানুষই সচরাচর এই গীবতরূপ হীন অস্ত্র ব্যবহার করে । আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন মানুষ কখনই এই নোংরা অস্ত্র ব্যবহার করার জন্য এত নিম্নস্তরে নামে না । কোন এক বিখ্যাত ব্যক্তি একদা বলেন "আমি আমার শত্রুর গীবত করার মত এত নিম্ন পর্যায়ে কখনও নামি না, কারণ গীবত হচ্ছে দূর্বল, হীন এবং নীচ ব্যক্তিদের হাতিয়ার ।"

গীবত হচ্ছে ঐ সমস্ত বক্তব্য যা কোন ব্যক্তির উপস্থিতিতে বলা হলে তা শ্রবনে সে অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হতো । যা বলা হয় তা যদি সত্য হয় তবুও তা গীবত । কিন্তু যদি তা মিথ্যা হয় তবে তাতে গীবত ও কূৎসা উভয়টাই করা হয় ।

বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে গীবত অনুমোদিত হতে পারে ঃ

প্রথমতঃ যদি কোন কর্মকর্তার নিকট অভিযোগ উপস্থাপন করা হয় যাতে তাঁর সাহায্যে অনিষ্ট দূর করে ন্যায় বিচার কায়েম করা যায় ।

দ্বিতীয়তঃ অন্যের সাথে একত্রে কাজ করার চিন্তা ভাবনা করছে এমন কেউ যদি তোমার পরামর্শ নিতে আসে এবং তুমি যদি নিঃস্বার্থভাবে শুধুমাত্র তার উপকারের নিমিত্তে তাকে পরামর্শ দানের জন্য বলো, "তার সাথে একত্রে কাজ করো না, কারণ তা হবে তোমার জন্য ক্ষতিকর ।"

তৃতীয়তঃ যদি কারো অসম্মান ও কূখ্যাতি গাওয়া উদ্দেশ্য না হয় কিন্তু শুধুমাত্র মানুষকে সচেতন করার নিমিত্তে কেউ বলে, "ঐ বোকা ও বিভ্রান্ত লোকটি অমুক-অমুক জায়গায় গিয়েছিল ।"

চতূর্থতঃ যার সম্বন্ধে গীবত করা হয় সে যদি হয় প্রকাশ্য ও নির্লজ্জ পাপী, খারাপ কাজে যার কোন দুঃখ বোধ নেই বরং পাপকার্যে সে গর্ববোধ করে, কূ-কর্মে আনন্দবোধ করে এবং কোন প্রকাশ্য পাপ কাজে ইতস্ততঃবোধ করে না ।

এ সমস্ত বিশেষ ক্ষেত্রে গীবত করা অনুমদিত হতে পারে যদি তা নিঃস্বার্থভাবে, শুধুমাত্র সত্যের খাতিরে এবং জনকল্যাণে করা হয় । কিন্তু উপরোক্ত ক্ষেত্র ছাড়া গীবত সৎ আমলকে নিঃশেষ করে দেয় যেমন আগুন কাঠকে জ্বালিয়ে শেষ করে ফেলে।

যদি কেউ গীবতে লিপ্ত হয়ে থাকে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে তা শ্রবন করে থাকে তবে সে যেন বলে, " হে আল্লাহ ক্ষমা করুন আমাকে ; এবং তাকে যার সম্পর্কে আমি খারাপ বলেছি । " এছাড়া গীবতকৃত ব্যক্তির সাথে যখনই দেখা হয় তখনই তাকে বলবে, " আমাকে ক্ষমা করুন " ।

চিরস্থায়ী এবং তিনিই চিরস্থায়ী !

সাঈদ নূ রসী

* * *